ইউনিট ৫
অর্থনৈতিক বৃক্ষ পরিচিতি

ইউনিট ৫ অর্থনৈতিক বৃক্ষ পরিচিতি

বাংলাদেশে প্রায় ৫০০ প্রজাতির অধিক বৃক্ষ রয়েছে। প্রতিটি বৃক্ষের নির্দিষ্ট গুণাবলী থাকলেও অর্থনৈতিকভাবে প্রায় ৫০টি বৃক্ষ গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যেও সব বৃক্ষের চাহিদা এক প্রকার নয়। আসবাবপত্রের জন্য যে কাঠ ব্যবহার করা হয় তা দিয়ে দরজা, জানালার চৌকাঠ বানানো যাবে না। আমাদের দেশে আসবাবপত্রের জন্য সেগুন, মেহগনি, গামার, কড়ই ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। দরজা, জানালার চৌকাঠে জারুল, গরুর গাড়ির চাকার জন্য বাবলা, দিয়াশলাইয়ের কাঠির জন্য ছাতিয়ান, পিটালি, কদম ইত্যাদি বৃক্ষের ব্যবহার রয়েছে।

এ ইউনিটের বিভিন্ন পাঠে সেগুন, মেহগনি, শিশু, জারুল, শাল, শিলকড়ই, রেইনট্রি, ইপিল-ইপিল, ছন, গোলপাতা প্রভৃতি অর্থনৈতিক বৃক্ষের পরিচয়, উদ্ভিদতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, পরিবেশ চাহিদা, আদি নিবাস, রোপণের উপযুক্ত স্থান, বংশবিস্তার পদ্ধতি, রোগবালাই, ব্যবহার প্রভৃতি বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠ ৫.১ সেগুন ও মেহগনি

এ পাঠ শেষে আপনি -

- সেগুন ও মেহগনি গাছের পরিচয় বলতে পারবেন।
- সেগুন ও মেহগনি গাছের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে পারবেন।
- সেগুন ও মেহগনি গাছ কী ধরনের জমিতে হয় তা বলতে পারবেন।
- সেগুন ও মেহগনি গাছের বংশবিস্তার সম্পর্কে লিখতে পারবেন।
- সেগুন ও মেহগনি গাছের রোগবালাই আলোচনা করতে পারবেন।

সেগুন

পরিচয় ঃ সেগুন ভারবেনেসি (Verbenaceae) গোত্রভুক্ত বৃক্ষ। স্থানীয়ভাবে এটি সেগুন নামে পরিচিত। সেগুনের বৈজ্ঞানিক নাম *Tectona grandis (টেকটোনা গ্র্যান্ডিস)*।

সেগুন পত্রঝরা প্রকৃতির বৃহদাকার বৃক্ষ। উচ্চতায় এটি ২৫-৩৫ মি. পর্যন্ত হয়। এর কাঠ অত্যন্ত দীর্ঘস্থায়ী, সহজে পোকায় ধরে না।

উদ্ভিদতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ সেগুন পত্রঝরা প্রকৃতির বৃহদাকার বৃক্ষ। উচ্চতায় এটি ২৫-৩৫ মি. পর্যন্ত হয়। সেগুনের বাকল হালকা বাদামি অথবা ধূসর রঙের হয়ে থাকে। পাতা দেখতে ডিম্বাকৃতি ও খসখসে। সেগুনের কাঠ আহরণের অব্যবহিত পর সোনালি বর্ণের হয়ে থাকে। পরবর্তীতে এটি বাদামি রঙ ধারণ করে। সেগুনের কাঠ মাঝারি শক্ত, অত্যন্ত টেকসই এবং ভার্সিসের পর খুব সুন্দর দেখায়। সেগুন কাঠ অত্যন্ত দীর্ঘস্থায়ী, সহজে পোকার আক্রমণ হয় না। ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে সেগুনের বীজ সংগ্রহ করতে হয়।

উপযুক্ত পরিবেশ ঃ নিচু জমি ছাড়া যে কোনো মাটিতে সেগুন ভালো জন্মে।

আদি নিবাস ঃ সেগুনের আদি নিবাস ভারত ও মায়ানমার (বার্মা)।

প্রাপ্তিস্থান ঃ রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও সিলেটের পাহাড়ি বনের বাগানসমূহে ১৮৭৩ সাল থেকে সেগুন বাগান উত্তোলন করা হয়ে আসছে। তাছাড়া ইদানিং সড়কের পাশে এবং বাড়ির আঙ্গিনায় বনায়নের জন্যও সেগুন গাছ লাগানো হচ্ছে।

বংশবিস্তার ঃ সাধারণত বীজ থেকে স্ট্যাম্প তৈরি করে সেগুনের বংশবিস্তার করা হয়ে থাকে।

কাঠের মধ্যে সেগুন সবার সেরা। আসবাবপত্র তৈরি, জাহাজ নির্মাণ, দরজা-জানালা তৈরিতে সেগুন কাঠ ব্যবহৃত হয়।

ব্যবহার ঃ কাঠের মধ্যে সেগুন সবার সেরা। আসবাপত্র তৈরি, জাহাজ নির্মাণ, দরজা-জানালা তৈরিতে সেগুন কাঠ ব্যবহৃত হয়। বাদ্যযন্ত্র তৈরি খোদাই শিল্পেও সেগুনের চাহিদা অত্যধিক। সেগুন গাছ থেকে কাঠ ছাড়াও এর বাঁকল থেকে হলুদ রঞ্জক (dye) পাওয়া যায়। সেগুনের কচি পাতা থেকে পাওয়া যায় লাল রঞ্জক।

রোগবালাই ঃ সেগুনের কোনো বড় ধরনের রোগ দেখা যায় না। তবে নার্সারিতে এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া শিকড় পচা রোগ সৃষ্টি করতে পারে। বড় গাছের পাতাঝরা রোগ দেখা যায় যা খুব বেশি ক্ষতিকর নয়। এছাড়া বড় গাছে এক ধরনের পরগাছা দেখা যায়। কেবল এক প্রজাতির গাছ না লাগালে পরগাছাও তেমন কোনো সমস্যা নয়।

মেহগনি

পরিচয় ঃ মেহগনি মেলিয়েসি গোত্রভুক্ত বৃক্ষ। মেহগনি গাছের বৈজ্ঞানিক নাম *(Swietenia macrophylla (সুইটেনিয়া ম্যাক্রোফাইলা)*।

মেহগনি একটি চিরসবুজ বৃক্ষ। এর বাকল অমসৃণ এবং সামান্য স্পর্শে ছোট ছোট টুকরায় বাকল খসে পড়ে।

উদ্ভিদতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ মেহগনি একটি চিরসবুজ বৃক্ষ। এর বাকল অমসৃণ এবং সামান্য স্পর্শে ছোট ছোট টুকরায় বাক খসে পড়ে। মেহগনির পরিপুষ্ট পাতা ৫০-৬০ সে.মি. দীর্ঘ হয় এবং পাতাসংলগ্ন বৃন্ত ৬-১৬ সে.মি. দীর্ঘ হয়। মেহগনির ফুল সবুজাভ সাদা। ক্ষুদ্র বৃন্তের আগায় ১ সে.মি. এর কম চওড়া ফুল ফোটে। মার্চ-এপ্রিল মাসে মেহগনির ফুল ফোটে। ডিসেম্বর-ফেব্রুয়ারি মাসে ফল পরিপক্ক হয়।

প্রাপ্তিস্থান ঃ দেশের সর্বত্র সড়কের ধারে এ গাছ জন্মে। পার্বত্য চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের বনাঞ্চলে এর আবাদ করা হয়েছে। তাছাড়া দেশের উত্তরাঞ্চলেও বসতভিটা, সড়ক ও পতিত জমিতে এর চাষ করা হয়ে থাকে।

প্রাপ্তিস্থান ঃ দেশের সর্বত্র সড়কের ধারে এ গাছ জন্মে। পার্বত্য চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের বনাঞ্চলে এর আবাদ করা হয়েছে। তাছাড়া দেশের উত্তরাঞ্চলেও বসতভিটা, সড়ক ও পতিত জমিতে এর চাষ করা হয়ে থাকে।

আদি নিবাস ঃ মেহগনির আদি নিবাস জামাইকা এবং মধ্য আমেরিকা।

বংশবিস্তার ঃ সাধারণত বীজের মাধ্যমে মেহগনির বংশবিস্তার হয়ে থাকে।

আসবাবপত্র ও প্লাইউড তৈরি, বাদ্যযন্ত্র তৈরি, জাহাজ নির্মাণের জন্য মেহগনি কাঠ ব্যবহার করা হয়।

ব্যবহার ঃ আসবাবপত্র ও প্লাইউড তৈরি, বাদ্যযন্ত্র তৈরি, জাহাজ নির্মাণের জন্য মেহগনি কাঠ ব্যবহার করা হয়। মেহগনি কাঠ খুব মূল্যবান।

রোগবালাই ঃ গোড়া পচন, পাতায় ক্ষত (Leaf spot), শিকড় পচন, কাঠ ক্ষয় ইত্যাদি মেহগনির প্রধান রোগবালাই। কান্ড ছিদ্রকারি পোকাও মেহগনির একটি প্রধান আক্রমণকারী কীট। চারা অবস্থায় মেহগনিকে কলার অঞ্চলে এক ধরনের কীট আক্রমণ করে থাকে।

সারমর্ম ঃ সেগুন ও মেহগনি উভয়ই বিদেশী গাছ। তবে দীর্ঘদিন ধরে আমাদের দেশে চাষ হওয়াতে এ দুটি গাছ আমাদের প্রাকৃতিক গাছের মতোই জন্মে। উভয়ই ভালো কাঠ উৎপাদনকারী। সেগুন স্ট্যাম্প দ্বারা চাষ হয় এবং বীজ থেকে উৎপাদিত চারার মাধ্যমে মেহগনি চাষ করা হয়। সেগুন ও মেহগনি বনাঞ্চলে লাগানো হলেও বসতভিটা ও সড়কের ধারে প্রচুর মেহগনির চাষ করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। সেগুনের আদি নিবাস কোথায়?
- ক) বাংলাদেশ।
- খ) নেপাল
- গ) শ্রীলংকা
- ঘ) ভারত ও মায়ানমার

২। কীভাবে সেগুনের বংশবিস্তার করা হয়?
- ক) বীজ দ্বারা
- খ) অঙ্গজ প্রজননের মাধ্যমে
- গ) স্ট্যাম্প দ্বারা
- ঘ) কপিসিং পদ্ধতিতে

৩। বাংলাদেশে কোথায় কোথায় সেগুনের বাগান আছে?
- ক) রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও সিলেটে
- খ) ঢাকা, ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইলে
- ঘ) রংপুর, দিনাজপুর ও বগুড়াতে
- গ) খুলনা, বরিশাল ও পিরোজপুরে

৪। মেহগনি গাছের বাকল কী রকম?
- ক) মসৃণ
- খ) অমসৃণ
- গ) নরম
- ঘ) শক্ত

৫। মেহগনি গাছের ফুল দেখতে কী রকম?
- ক) লাল
- খ) সাদা
- গ) সবুজাভ সাদা
- ঘ) নীল

৬। মেহগনির আদি নিবাস কোথায়?
- ক) কেনিয়া
- খ) ভারত
- গ) মায়ানমার
- ঘ) জামাইকা ও মধ্য আমেরিকা

৭। মেহগনির বংশবিস্তার কীভাবে হয়?
- ক) বীজের মাধ্যমে
- খ) অঙ্গজ প্রজননের মাধ্যমে
- গ) কপিসিং এর মাধ্যমে
- ঘ) স্ট্যাম্প এর মাধ্যমে

পাঠ ৫.২ শিশু ও জারুল

এ পাঠ শেষে আপনি -

- শিশু ও জারুল গাছের পরিচয় বলতে পারবেন।
- শিশু ও জারুল গাছের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে পারবেন।
- শিশু ও জারুল গাছ লাগানোর উপযোগী জমি সম্পর্কে লিখতে পারবেন।
- কীভাবে শিশু ও জারুল গাছ বংশবিস্তার করে তা উল্লেখ করতে পারবেন।
- শিশু ও জারুল গাছের রোগবালাই বর্ণনা করতে পারবেন।

শিশু

পরিচয় ঃ শিশু লিগোমিনোসি (Leguminosae) গোত্রের পেপিলিওনেডি (Papilionoideae) উপগোত্রের বৃক্ষ। শিশু গাছের বৈজ্ঞানিক নাম *Dalbergia sissoo (ডেলবারজিয়া শিশু)*।

শিশু মাঝারি আকারের পত্রঝরা প্রকৃতির বৃক্ষ। অবশ্য উপযুক্ত পরিবেশে এটি বৃহদাকার বৃক্ষে পরিণত হয়।

উদ্ভিদতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ শিশু মাঝারি আকারের পত্রঝরা প্রকৃতির বৃক্ষ। অবশ্য উপযুক্ত পরিবেশে এটি বৃহদাকার বৃক্ষে পরিণত হয়। এর পরিপুষ্ট পাতা ১০-২৫ সে.মি. দীর্ঘ। শিশু গাছের ফুল হলুদাভ সাদা। ফুল থেকে সিমের মতো চ্যাপ্টা ফল হয় যা দৈর্ঘ্যে ৫-৭ সে.মি. এবং প্রস্থে ০.৮-১.২ সে.মি.। ফলের রঙ ফ্যাকাশে বাদামি এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সিমের মধ্যে একটি মাত্র বীজ থাকে। তবে কখনও কখনও ২-৩টি বীজ থাকতেও দেখা যায়। শীত মওসুমে শিশু গাছে সমস্ত পাতা ঝরে যায়। জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে নতুন পাতা গজায়। ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে শিশু গাছে ফুল ফোটে এবং অক্টোবর-জানুয়ারি মাসে ফল পাকে।

উপযুক্ত পরিবেশ ঃ শিশু গাছ বিভিন্ন প্রকার মাটিতে জন্মায়। এটি শুষ্ক অঞ্চলেও ভালো হয়। তবে প্রাকৃতিকভাবে শিশু পলিমাটিতে খুব ভালো জন্মায়। পর্যাপ্ত আলো ছাড়া শিশু গাছ ভালো হয় না। সাময়িক বন্যা শিশু গাছের কোনো ক্ষতি করতে পারে না। মাসাধিকাল পানির নিচে থাকে এমন স্থানেও শিশু গাছ সজীব থাকে।

আদি নিবাস ঃ ভারত, নেপাল, পাকিস্তান এবং আফগানিস্থান সংলগ্ন হিমালয়ের পাদদেশ শিশু গাছের আদি নিবাস।

শিশু গাছ রোপন ঃ বাংলাদেশের সর্বত্রই শিশু গাছ রোপণ করা হয়ে থাকে। সাম্প্রতিককালে যশোর, পাবনা এবং কুষ্টিয়া অঞ্চলে শিশু গাছ রোপণ কর্মসূচী জোরদার করা হয়েছে।

বংশবিস্তার ঃ প্রধানত বীজ এবং কর্তিত বৃক্ষের গোড়ালির (Stump) মাধ্যমে শিশু গাছের বংশবিস্তার ঘটে থাকে। শিশু গাছের কপিসিং ক্ষমতা ভালো।

শিশু গাছ থেকে জ্বালানি কাঠ ছাড়াও আসবাবপত্র, গরুর গাড়ির চাকা, গরুর গাড়ি, ঢোল ইত্যাদি তৈরি হয়।

ব্যবহার ঃ শিশু গাছ থেকে উন্নতমানের জ্বালানি কাঠ পাওয়া যায়। এর কাঠ অত্যন্ত মজবুত এবং দীর্ঘস্থায়ী। আসবাবপত্র, গরুর গাড়ির চাকা, গরুর গাড়ি, ঢোল ইত্যাদি তৈরি করার কাজে শিশু গাছ ব্যবহৃত হয়। শিশু গাছের পাতা এবং ক্ষুদ্র ডালগুলি পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

রোগবালাই ঃ ফিউজারিয়াম উইল্ট বা নুইয়ে পড়া এবং শিকড় পচন এ দুটো শিশু গাছের প্রধান ছত্রাক রোগ।

জারুল

পরিচয় ঃ জারুল লাইথ্রেসি (Lythraceae) গোত্রের বৃক্ষ। এর স্থানীয় নাম জারুল । ইংরেজিতে একে কুইন ফ্লাওয়ার (Queen flower), প্রাইড অব ইন্ডিয়া (Pride of India) বলা হয়। জারুলের বৈজ্ঞানিক নাম *Lagerstroemia speciosa (লেজারস্ট্রিমিয়া স্পেসিওসা)*।

জারুল একটি বিশাল পত্রঝরা বৃক্ষ। এর বাকল হালকা ছাই রঙের অথবা ফ্যাকাশে বাদামি রঙের।

উদ্ভিদতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ জারুল একটি বিশাল পত্রঝরা বৃক্ষ। এর বাকল হালকা ছাই রঙের অথবা ফ্যাকাশে বাদামি রঙের। পাতা সরল। শীত মওসুমে জারুলের পাতা লালচে অথবা তামাটে বর্ণ ধারণ করে এবং ক্রমান্বয়ে ঝরে যেতে থাকে। মার্চ-এপ্রিলে গাছে নতুন পাতা আসে। এপ্রিল-জুন সময়কালে জারুল গাছে ফুল ফোটে এবং অক্টোবর-জানুয়ারি সময়কালে ফল হয়।

উপযুক্ত পরিবেশ ঃ মিঠা পানির কর্দমাক্ত স্থানে, চিরসবুজ বনের কর্দমাক্ত স্থানে এবং শাল বনে জারুল গাছ লাগানো হয়ে থাকে। এ ছাড়া রাস্তার দুপাশেও এ গাছ লাগানো হয়।

প্রাপ্তিস্থান ঃ ভারতের সর্বত্র, বাংলাদেশ, মায়ানমার, শ্রীলংকা, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন এবং মালয়েশিয়ায় জারুল গাছ দেখতে পাওয়া যায়।

রোপন ঃ প্রধানত রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও চট্টগ্রামের বনাঞ্চলের নিম্ন এলাকায় এর বাগান করা হয়। তাছাড়া শাল বনেও জারুল গাছ দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়া রাস্তার পাশে, জলাভূমির ধারে জারুল গাছ রোপণ করা হয়ে থাকে।

বংশবিস্তার ঃ সাধারণত বীজের মাধ্যমে জারুল গাছের বংশবিস্তার করা হয়। জারুল গাছের কপিসিং ক্ষমতা খুব ভালো।

দরজা, জানালার ফ্রেম, জাহাজ ও নৌকা তৈরিতে, দালান নির্মাণে, রেলগাড়ির বগি নির্মাণে, ট্রাকের বডি, কৃষি যন্ত্রপাতি, রেলওয়ে স্লিপার তৈরিতে জারুল গাছ ব্যবহৃত হয়।

ব্যবহার ঃ দরজা, জানালার ফ্রেম, জাহাজ ও নৌকা তৈরিতে, দালান নির্মাণে, রেলগাড়ির বগি নির্মাণে, ট্রাকের বডি, কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরিতে, রেলওয়ে স্লিপার তৈরিতে জারুল গাছ ব্যবহার অপরিহার্য। এছাড়াও জারুল গাছের আরও বহুবিধ ব্যবহার রয়েছে।

রোগবালাই ঃ জারুল গাছ পরজীবী পরগাছা দ্বারা খুব বেশি আক্রান্ত হয়। নার্সারির চারাগাছ সাধারণত হোয়াইট গ্রাবস পোকা দ্বারা আক্রান্ত হয়।

সারমর্ম ঃ শিশু খুব উন্নতমানের কাঠ দেয়। জারুল কাঠ উন্নতমানের হলেও এর ব্যবহার দরজা জানালার চৌকাঠ তৈরি ও কৃষি সামগ্রী উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। শিশু ও জারুল দীর্ঘদিন জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে। জারুল আমাদের দেশীয় গাছ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। শিশু গাছের ফুলের রঙ কী রকম?
- ক) হলুদাভ সাদা
- খ) নীলাভ সাদা
- গ) সবুজাভ সাদা
- ঘ) লাল

২। কোন্ মাসে শিশু গাছে ফুল ফোটে?
- ক) ডিসেম্বর-জানুয়ারি
- খ) ফেব্রুয়ারি-মার্চ
- গ) মার্চ-এপ্রিল
- ঘ) মে-জুন

৩। কোন্ মাসে শিশু গাছের ফল পাকে?
- ক) জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি
- খ) মার্চ-এপ্রিল
- গ) জুন-সেপ্টেম্বর
- ঘ) অক্টোবর-জানুয়ারি

৪। কোন্ মাসে জারুল গাছে ফুল ফোটে?
- ক) জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি
- খ) এপ্রিল-জুন
- গ) মার্চ-এপ্রিল
- ঘ) নভেম্বর-ডিসেম্বর

৫। কোন্ সময়ে জারুল গাছে ফল হয়?
- ক) ফেব্রুয়ারি -মার্চ
- খ) জুন-আগস্ট
- গ) অক্টোবর-জানুয়ারি
- ঘ) এপ্রিল-মে

৬। কোন্ কোন্ দেশে জারুল গাছ পাওয়া যায়?
- ক) আফ্রিকা ও ইন্দোনেশিয়া
- খ) ভারতের সর্বত্র, বাংলাদেশ, মায়ানমার, শ্রীলংকা, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন ও মালয়েশিয়া
- গ) আমেরিকা, ভারত, মায়ানমার ও শ্রীলংকা
- ঘ) অস্ট্রেলিয়া, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন ও মালয়েশিয়া

পাঠ ৫.৩ শাল ও শিলকড়ই

এ পাঠ শেষে আপনি -

- শাল ও শিলকড়ই গাছের পরিচয় বলতে পারবেন।
- শাল ও শিলকড়ই গাছের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশে শাল ও শিলকড়ই গাছ কী ধরনের জমিতে হয় তা লিখতে পারবেন।
- কীভাবে শঅল ও শিলকড়ই গাছ বংশবিস্তার করে তা বলতে ও লিখতে পারবেন।
- শাল ও শিলকড়ই গাছের রোগবালাই বর্ণনা করতে পারবেন।

শাল

পরিচয় ঃ শাল ডিপটারোকারপেসি (Dipterocarpaceae) গোত্রের গাছ। বাংলাদেশে এটি শাল ও গজারি নামে পরিচিত। এর বৈজ্ঞানিক নাম *(Shorea robusta) (শোরিয়া রোবাস্টা)*।

শাল বড় এবং সোজা কান্ডবিশিষ্ট পত্রঝরা প্রকৃতির বৃক্ষ। এর উচ্চতা ২৫-৩০ মিটার হয়। ঢাকা, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, দিনাজপুর, রংপুরের বিখ্যাত গজারি বনই শাল বৃক্ষের প্রধান বন।

উদ্ভিদতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ শাল বড় এবং সোজা কান্ডবিশিষ্ট পত্রঝরা প্রকৃতির বৃক্ষ। এর উচ্চতা হয়ে থাকে ২৫-৩০ মিটার। ঢাকা, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, দিনাজপুর, রংপুরের বিখ্যাত গজারি বনই এ শাল বৃক্ষের প্রধান বন। শাল গাছ কাটলে তার গোড়া থেকে পুনরায় গাছ গজায় বলে স্থানীয় জনসাধারণ শাল গাছকে গজারি গাছ বলে আখ্যায়িত করে থাকে। মূলত শালের কাটা মোথা থেকে গজানো চারাই গজারি নামে পরিচিত। শালের চারার বাকল ধূসর বাদামি। বড় গাছের বাকল ঘন বাদামি ও ফাটা ফাটা। কাঠ ঘন বাদামি, শক্ত, দীর্ঘস্থায়ী এবং মজবুত। শাল পাতা ১০-২০ সে.মি. পর্যন্ত লম্বা হয়। পাতা মসৃণ ও চকচকে। ফুলের বর্ণ পীতাভ। জুন-জুলাই মাসে ফল সংগ্রহ করা হয়ে থাকে।

উপযুক্ত পরিবেশ ঃ লাল মাটি অঞ্চলে খুব ভালো জন্মে।

প্রাপ্তিস্থান ঃ বাংলাদেশ ও ভারত শাল গাছের আদি নিবাস।

বাংলাদেশে শাল ঃ ঢাকা, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ ও দেশের উত্তরাঞ্চলের বনভূমিতে শালগাছ জন্মায়।

বংশবিস্তার ঃ বীজ ও কপিসিংয়ের মাধ্যমে (মোথা থেকে গজানো চারা) শাল বংশবিস্তার করে থাকে।

খুঁটি, দরজা-জানালার ফ্রেম, রেলের স্লিপার, গরু গাড়ির চাকা, বাস-ট্রাকের বডি তৈরিতে ব্যাপক হারে শাল কাঠ ব্যবহার হয়। শালের ডালপালা, পাতা ও পরিত্যক্ত অংশ উৎকৃষ্ঠ জ্বালানি।

ব্যবহার ঃ খুঁটি, দরজা-জানালার ফ্রেম, রেলের স্লিপার, গরু গাড়ির চাকা, বাস-ট্রাকের বডি তৈরিতে ব্যাপক হারে শাল কাঠ ব্যবহার হয়। শালের ডালপালা, পাতা ও পরিত্যক্ত অংশ উৎকৃষ্ট জ্বালানি। শালের মোথা ও অন্যান্য অংশ থেকে ভালো মানের কাঠকয়লা প্রস্তুত করা যায়। শালের ফুল মৌচাকের উপযোগী। শালের বীজ থেকে তেল পাওয়া যায়। বাকলে ট্যানিন এবং রঞ্জক আছে।

রোগবালাই ঃ শালে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য রোগবালাই দেখা যায় না।

শিলকড়ই

পরিচয় ঃ শিলকড়ই লিগোমিনোসি গোত্রের ও মাইমোসইডি (Mimosoideae) উপগোত্রের বৃক্ষ। এর স্থানীয় নাম সাদাকড়ই বা অসীম।

শিলকড়ই চিরসবুজ বনের গাছ। এটি ৮-১৫ মি. উঁচু হয়ে থাকে। এর বাকল মসৃণ হয়ে থাকে।

উদ্ভিদতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ শিলকড়ই চিরসবুজ বনের গাছ। এটি ৮-১৫ মি. উঁচু হয়ে থাকে। এর বাকল মসৃণ হয়ে থাকে। বাকলের রং সবুজাভ থেকে গাঢ় বাদামি। বাকল কখনও কখনও সমান্তরালভাবে কুঁচকানো থাকে। পাতা যৌগিক। গ্রীষ্মকালে স্বল্পকালীন সময়ের জন্য বৃক্ষটি পত্রবিহীন থাকে। এপ্রিল-জুন মাসে শিলকড়ই গাছে ফুল ফোটে এবং আগস্ট-অক্টোবর মাসে ফল হয়। শীত মওসুমে সিমের মতো ফলগুলো পাকে।

উপযুক্ত পরিবেশ ঃ আর্দ্র দোআঁশ মাটি এবং শুকনো দোআঁশ মাটিতে শিলকড়ই ভালো জন্মে।

আদি নিবাস ঃ হিমালয়ের পূর্বাঞ্চল, মায়ানমার এবং সিঙ্গাপুর শিলকড়ই গাছের আদি নিবাস।

শিলকড়ই রোপণ ঃ বাংলাদেশের উত্তর এবং পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলাগুলোতে শিলকড়ই গাছের আধিক্য দেখা যায়।

বংশবিস্তার ঃ সাধারণত বীজের মাধ্যমেই শিলকড়ই গাছের বংশবিস্তার ঘটে থাকে।

শিলকড়ইয়ের কাঠ খুব দীর্ঘস্থায়ী। তাই এটি আসবাবপত্র তৈরির জন্য অত্যন্ত উপযোগী।

ব্যবহার ঃ শিলকড়ইয়ের কাঠ খুব দীর্ঘস্থায়ী। ফলে এটি আসবাবপত্র তৈরির জন্য অত্যন্ত উপযোগী। এছাড়াও শিলকড়ইয়ের বহুবিধ ব্যবহার রয়েছে। ভারতের আসাম অঞ্চলে শিলকড়ই থেকে লাক্ষা সংগ্রহ করা হয়ে থাকে।

রোগবালাই ঃ শিলকড়ই গাছ প্রায় রোগবালাই মুক্ত।

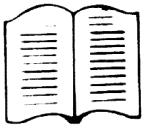

সারমর্ম ঃ শাল ও শিলকড়ই আমাদের দেশীয় গাছ। শাল সাধারণত ঢাকা, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, রংপুর ও দিনাজপুরে পাওয়া যায়। কিন্তু শিলকড়ই সারাদেশের বসতভিটায় পাওয়া যায়। শাল কাঠ খুঁটি, কাঠের দরজা-জানালার ফ্রেম, রেলের স্লিপার, গরু গাড়ির চাকা, বাস-ট্রাকের বডি তৈরিতে ব্যাপক হারে ব্যবহৃত হয়। শিলকড়ই কাঠ আসবাবপত্র তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। শাল বন কোথায় দেখা যায়?
- ক) চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারে
- খ) রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে
- গ) খুলনা ও সাতক্ষীরায়
- ঘ) ঢাকা, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, রংপুর ও দিনাপুরে

২। কীভাবে শাল গাছের বংশবিস্তার করানো হয়?
- ক) বীজ ও কপিসিংয়ের মাধ্যমে
- খ) স্ট্যাম্প লাগিয়ে
- গ) কলমের মাধ্যমে
- ঘ) কপিসিংয়ের মাধ্যমে

৩। কোন্ মাসে শালের ফল সংগ্রহ করতে হয়?
- ক) জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি
- খ) জুন-জুলাই
- গ) আগস্ট-সেপ্টেম্বর
- ঘ) অক্টোবর-নভেম্বর

৪। কোন্ সময়ে শিলকড়ই গাছে পাতা থাকে না?
- ক) গ্রীষ্ম
- খ) বর্ষা
- গ) শীত
- ঘ) বসন্ত

৫। শিলকড়ইয়ের আদি নিবাস কোথায়?

ক) হিমালয়ের পূর্বাঞ্চল, মায়ানমার ও সিঙ্গাপুর
খ) আফ্রিকা
গ) আমেরিকা
ঘ) অস্ট্রেলিয়া

৬। শিলকড়ই কীভাবে বংশবিস্তার করে?
ক) বীজের মাধ্যমে
খ) কাটিং
গ) কপিসিং
ঘ) কলম

পাঠ ৫.৪ রেইনট্রি ও ইপিল-ইপিল

এ পাঠ শেষে আপনি Ñ

- রেইনট্রি ও ইপিল-ইপিল গাছের পরিচয় বলতে পারবেন।
- রেইনট্রি ও ইপিল-ইপিল গাছের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশে রেইনট্রি ও ইপিল-ইপিল গাছ কী ধরনের জমিতে হয় তা লিখতে পারবেন।
- কীভাবে রেইনট্রি ও ইপিল-ইপিল গাছ বংশবিস্তার করে তা লিখতে পারবেন।
- রেইনট্রি ও ইপিল-ইপিল গাছের রোগবালাই বর্ণনা করতে পারবেন।

রেইনট্রি

পরিচয় ঃ রেইনট্রি লিগোমিনোসি (Leguminosae) গোত্রের মিইমোসইডি (Minosoideae) উপগোত্রের বৃক্ষ। এর স্থানীয় নাম বিলাতি শিরিষ, রেন্ট্রিকড়ই, মিগনি, মেগনিষ ইত্যাদি। রেইনট্রির বৈজ্ঞানিক নাম *Samanea saman* or *Albizia saman (স্যামানিয়া স্যামান বা অ্যালবিজিয়া স্যামান)*।

রেইনট্রি মাঝারি থেকে বৃহৎ আকারের বৃক্ষ। এর পাতা যৌগিক এবং মুকুট ছড়ানো।

উদ্ভিদতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ রেইনট্রি মাঝারি থেকে বৃহৎ আকারের বৃক্ষ। পাতা যৌগিক। রেইনট্রি মুকুট ছড়ানো। মার্চ-অক্টোবর মাসে রেইনট্রি ফুল ফোটে এবং নভেম্বর-মার্চ মাসে ফুল থেকে ফল হয়।

উপযুক্ত পরিবেশ ঃ বিভিন্ন রকম মাটিতে রেইনট্রি খুব ভালো জন্মায়। প্রচুর আলো ছাড়া রেইনট্রি ভালো হয় না। জলাবদ্ধ অবস্থাতে রেইনট্রি কোনো ক্ষতি হয় না।

প্রাপ্তিস্থান ঃ মূলত দক্ষিত আমেরিকার ব্রাজিল হচ্ছে রেইনট্রির আদি নিবাস। তবে বর্তমানে এটি নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের অনেক দেশেই দেখা যায়।

রেইনট্রি রোপণ ঃ বাংলাদেশের সর্বত্র রেইনট্রি প্রধানত সড়কপার্শ্বস্থ বৃক্ষ হিসেবে রোপণ করা হয়ে থাকে। তবে দক্ষিণাঞ্চলীয় জেলাগুলোতে বাড়ির আঙ্গিনায় রেইনট্রি লাগানো হয়।

বংশবিস্তার ঃ বীজের মাধ্যমে এবং ডালের কাটিংয়ের মাধ্যমে খুব সহজেই রেইনট্রি বংশবিস্তার লাভ করে। রেইনট্রি দ্রুত বর্ধনশীল বৃক্ষ। কিছুকাল পরপর এর শাখাপ্রশাখা ছেটে দেয়া যায়। রেইনট্রির কপিসিং ক্ষমতা খুব ভালো।

রেইনট্রির কাঠ প্রধানত আসবাবপত্র তৈরির জন্য এবং ডালপালা জ্বালানি কাঠ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

ব্যবহার ঃ রেইনট্রি কাঠ প্রধানত আসবাবপত্র তৈরির জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এর ডালপালা জ্বালানি কাঠ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এর কচি সিম গরু মহিষের উপাদেয় খাদ্য। এটি একটি প্রচলিত ধারণা যে, রেইনট্রির কচি সিম খেলে গরুর দুধের মানের উন্নতি ঘটে।

রোগবালাই ঃ রেইনট্রির নির্দিষ্ট কোনো রোগবালাই এখন পর্যন্ত চিহ্নিত হয় নি।

ইপিল-ইপিল

পরিচয় ঃ ইপিল-ইপিল লিগোমিনোসি (Leguminosae) গোত্রের মিইমোসইডি (Minosoideae) উপগোত্রের গাছ। এর স্থানীয় নাম তেলি কদম, ইপিল-ইপিল। ইপিল-ইপিলের বৈজ্ঞানিক নাম *Leucaena leucocephala (লিউকিনা লিউকোসোফালা)*।

ইপিল-ইপিল একটি দ্রুত বর্ধনশীল খর্বাকৃতির গাছ। এর উচ্চতা ৫ মি. পর্যন্ত হয়।

উদ্ভিদতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ ইপিল-ইপিল একটি দ্রুত বর্ধনশীল খর্বাকৃতির গাছ। এর উচ্চতা ৫ মি. পর্যন্ত হয়। এর বাদামি রঙের বাকলটি মসৃণ। এর পাতা পালকের মতো। চ্যাপ্টা সিমের মতো ফলগুলো হয় সোজা। বড় বড় থোকায় ফল হয়। বছরে দুবার মার্চ-এপ্রিল এবং আগস্ট-অক্টোবর মাসে ফুল হয়। ফল হয় ডিসেম্বর-ফেব্রুয়ারি মাসে।

উপযুক্ত পরিবেশ ঃ ইপিল-ইপিল বিভিন্ন প্রকার মাটিতে নির্বিঘ্নে জন্মায়। জলাভূমি, দোআঁশ মাটি, পিএইচ ৭ এর কাছাকাছি বা সামান্য ক্ষারসমৃদ্ধ মাটিতেও ইপিল-ইপিল জন্মায়। তবে এসিড প্রধান মাটিতে ইপিল-ইপিল জন্মায় না।

প্রাপ্তিস্থান ঃ ইপিল-ইপিল আদি নিবাস মধ্য আমেরিকা। বর্তমানে অনেক নাতিশীতোষ্ণ দেশে ইপিল-ইপিলের ব্যাপক চাষাবাদ হচ্ছে।

ইপিল-ইপিল চাষ ঃ সাম্প্রতিককালে অনেক অঞ্চলে ইপিল-ইপিলের ব্যাপক চাষ শুরু হয়েছে।

বংশবিস্তার ঃ বীজের মাধ্যমে ইপিল-ইপিলের বংশবিস্তার ঘটে থাকে। তবে কপিসিং ক্ষমতাও খুব ভালো।

জ্বালানি কাঠ, পশুখাদ্য, কাগজের মন্ড তৈরির দিয়াশলাই শিল্পে, প্লাইউড এবং আসবাবপত্র তৈরতে ইপিল-ইপিল কাঠ ব্যবহৃত হয়।

ব্যবহার ঃ প্রধানত জ্বালানি কাঠ হিসেবে ইপিল-ইপিল ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ইপিল-ইপিলের পাতা পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তাছাড়া কাগজের মন্ড, দিয়াশলাই শিল্প, প্ল্যাইউড তৈরিতেও এর ব্যবহার রয়েছে। আসবাবপত্র তৈরিতে এর সীমিত ব্যবহার রয়েছে।

রোগবালাই ঃ এক ধরনের সাইলিড পোকা এ গাছকে আক্রমণ করে। বাংলাদেশে ১৯৮৯ সালে এর আক্রমণ দেখা গেলেও খুব বেশি ক্ষতি করেনি। তবে বিদেশে এ পোকা ইপিল-ইপিল গাছের খুব ক্ষতি করে বলে জানা যায়।

সারমর্ম ঃ রেইনট্রি ও ইপিল-ইপিল আমাদের দেশীয় গাছ নয়। তবে রেইনট্রি দীর্ঘদিন ধরে এদেশে চাষ করতে করতে এদেশের আবহাওয়ার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেছে। রেইনট্রি আমাদের বসতভিটায় ও সড়কের ধারে প্রচুর চাষ করা হয়। এটি একটি দ্রুত বর্ধনশীল গাছ। জ্বালানি হিসেবে ও আসবাবপত্র তৈরিতে এ কাঠ ব্যবহার করা হয়। ইপিল-ইপিল বিদেশী গাছ। অম্লীয় জমিতে এ গাছ হয় না। অন্যস্থানে, বিশেষ করে সড়কের ধারে এ গাছ ভালো জন্মে। এ গাছ জ্বালানি হিসেবে এবং গাছের পাতা গরু ছাগলের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। কোন্ মাসে রেইনট্রি গাছে ফুল ফোটে?
- ক) জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি
- খ) মার্চ-এপ্রিল
- গ) মার্চ-অক্টোবর
- ঘ) আগস্ট-সেপ্টেম্বর

২। রেইনট্রির আদি নিবাস কোথায়?
- ক) ব্রাজিল
- খ) আফ্রিকা
- গ) বাংলাদেশ
- ঘ) ভারত

৩। রেইনট্রি কীভাবে বংশবিস্তার করে?
- ক) বীজ ও কাটিংয়ের মাধ্যমে
- খ) বীজের মাধ্যমে
- গ) কপিসিংয়ের মাধ্যমে
- ঘ) কলমের মাধ্যমে

৪। কোন্ মাসে ইপিল-ইপিলের ফল হয়?
- ক) জুন-জুলাই
- খ) ডিসেম্বর-ফেব্রুয়ারি
- গ) অক্টোবর-নভেম্বর
- ঘ) মার্চ-এপ্রিল

৫। ইপিল-ইপিলের আদি নিবাস কোথায়?
- ক) ব্রাজিল
- খ) মধ্য আমেরিকা
- গ) বাংলাদেশ
- ঘ) ভারত

৬। ইপিল-ইপিল কীভাবে বংশবিস্তার করে?
- ক) বীজ ও কপিসিংয়ের মাধ্যমে
- খ) কপিসিংয়ের মাধ্যমে
- গ) কাটিংয়ের মাধ্যমে
- ঘ) কলমের মাধ্যমে

পাঠ ৫.৫ ছনজাতীয় ঘাস ও গোলপাতা চাষ

এ পাঠ শেষে আপনি -

- ছনজাতীয় ঘাস ও গোলপাতার পরিচয় বলতে পারবেন।
- ছন ও গোলপাতার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশে ছন ও গোলপাতা কী ধরনের জমিতে হয় তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- কীভাবে ছন ও গোলপাতা বংশবিস্তার করে তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- ছন ও গোলপাতার রোগবালাই সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

ছন

পরিচয় ঃ ছন গ্রামিনি পরিবারভুক্ত ঘাসজাতীয় উদ্ভিদ। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Imperata cylindrica* (ইমপেরাটা সিলিন্ড্রিকা)।

ছন ঘাসের মতো হলেও এটি ১.৫-২ মি. পর্যন্ত লম্বা হয়। এর পাতা চ্যাপ্টা, লম্বা এবং দুপাশ ধারালো।

উদ্ভিদতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ ছন ঘাসের মতো হলেও এটি ১.৫-২ মি. পর্যন্ত লম্বা হয়। এর পাতা চ্যাপ্টা, লম্বা এবং দুপাশ ধারালো। এর ফুল সাদা রঙের। মোথার মাধ্যমে ছনের বংশবিস্তার হয়।

উপযুক্ত পরিবেশ ঃ যে মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ কম এবং যেখানে কিছুই হয় না বললেই চলে এমন উন্মুক্ত স্থানে ছন খুব ভালো জন্মে। সূর্যালোক ছাড়া এ ঘাসের বৃদ্ধি হয় না। কাজেই এর চাষ করতে হলে পাহাড়ি এলাকায় যেখানে বড় গাছপালা আছে তা কেটে ফেলতে হবে।

প্রাপ্তিস্থান ঃ বাংলাদেশের সব পাহাড়ি অঞ্চলে ছন পাওয়া যায়। তবে যেখানে ঘন বনজঙ্গল আছে সেখানে এর বৃদ্ধি ভালো হয় না।

বাংলাদেশে ছন চাষ ঃ যে সব পাহাড়ি অঞ্চলে খুব বেশি গাছপালা নেই সেখানে ছনের চাষ করা হয়। এ ঘাস লাগাতে হয় না। বাঁশের মতো মোথা থেকে নতুন চারা গজায়।

বংশবিস্তার ঃ অঙ্গজ প্রজনন পদ্ধতিতে এ ঘাসের চাষ করা হয়। বর্ষার শুরুতে যেখানে ছনের চাষ করা হয় সেখানে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। ফলে আগাছা পুড়ে যায় এবং ছনের সাথে প্রতিযোগী আগাছাসমূহ বিনষ্ট হয়ে যায়। পক্ষান্তরে, ছাই মাটিতে মিশে মাটির পটাশের পরিমাণ বৃদ্ধি করে এবং বর্ষায় পাহাড়ি এলাকার মাটি ধুয়ে পাদদেশের নিচু জমিতে উর্বরতা শক্তি বাড়ায়। কিন্তু আগুনের ফলে ছনের কোনো ক্ষতি হয় না। কারণ, ছনের মোথা মাটির নিচে থাকে। কাজেই বর্ষার শুরুতে পানি প্রাপ্তির সাথে সাথে মোথা থেকে নতুন কুঁড়ি বের হয়ে এককভাবে ছনের বাগানোর সৃষ্টি হয়।

ঘরের ছাউনি এবং বেড়া তৈরিতে ছন ব্যবহার করা হয়। পুরনো ছন জ্বালানি হিসেবেও ব্যবহার করা যায়।

ব্যবহার ঃ ছন প্রধানত ঘরের ছাউনি হিসেবে ব্যবহার হয়। তাছাড়া অনেক সময় বেড়া হিসেবেও এ ছন ব্যবহার করা হয়। দক্ষিণপূর্বাঞ্চলের গামাঞ্চলের শতকরা ৯০ ভাগেরও বেশি বাড়ি তৈরিতে ছনকে ছাইনির কাজে ব্যবহার করে। ছন পুরনো হলে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

রোগবালাই ঃ ছনের কোনো রোগবালাই হয় না বললেই চলে। প্রাকৃতিভাবে জন্মে বলে এর রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা অধিক।

গোলপাতা

পরিচয় ঃ গোলপাতা নোনা অঞ্চলের গাছ। পামি (Palme) গোত্রভুক্ত এ গাছটির বৈজ্ঞানিক নাম *Nypa fruticans (নিপা ফ্রুটিক্যানস)*।

এ গাছটি ছোট আকৃতির, পাতা তালপাতার মতো ছড়ানো। গাছের গোড়া লবণাক্ত পানির নিচেই থাকে। শিকড় সিমের মতো মাটির সাথে ঘেষে ঘেষে ছড়ায়।

উদ্ভিদতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ এ গাছটি ছোট আকৃতির, পাতা তালপাতার মতো ছড়ানো। গাছের গোড়া লবণাক্ত পানির নিচেই থাকে। এ গাছের সিমের মতো মাটির সাথে ঘেষে ঘেষে ছড়ায়। শিকড় থেকেই ফুলের গোড়ালি বের হয়। ফুল সুপারি গাছের খোলসের মতো খোলস দিয়ে ঢাকা থাকে। গোলপাতার বীজ সুপারির মতো শক্ত, সাদা এবং খাওয়া যায়। দেখতে অনেকটা মুরগির ডিমের সমান।

উপযুক্ত পরিবেশ ঃ কেবল লবণাক্ত বা লোনা পানির বনে, বিশেষ করে সুন্দরবনে, এ গাছ দেখা যায়। ছায়াযুক্ত স্থানে এ গাছ ভালো জন্মে।

প্রাপ্তিস্থান ঃ বাংলাদেশের বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, খুলনা ও কক্সবাজারের চকোরিয়া, ফিলিপাইন, মায়ানমার, ভারত, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, উত্তর অস্ট্রেলিয়া এবং যুক্তরাস্ট্রের ফ্লোরিডা।

গোলপাতার চাষ ঃ এ গাছের চাষ করা হয় না। বীজ পড়ে প্রাকৃতিকভাবেই জন্মে। বীজ জোয়ারভাটার পানির সাথে এক স্থান হতে অন্যস্থানে ভেসে যায় এবং সেখানে গাছের চারা গজায়। কেবল ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এর উপযুক্ত পরিবেশ রক্ষা করা যায়। তবে মোথার মাধ্যমেও এর চাষ করা যায়।

বংশবিস্তার ঃ গাছ থেকেই প্রাকৃতিকভাবে বীজ মাটিতে পড়ে চারা জন্মায় এবং সে চারা থেকে বড় গাছ হয়।

গোলপাতার প্রধান ব্যবহার ঘরের ছাউনি তৈরিতে। এছাড়াও এর পাতা দিয়ে ঝুঁড়ি, ব্যাগ, টুপি, মাদুর ইত্যাদি বানানো যায়।

ব্যবহার ঃ গোলপাতাও ছনের মতো অত্যন্ত উপকারী গাছ। এর পাতা এদেশের দক্ষিণপশ্চিমাঞ্চলে ঘর ছাউনির জন্য ব্যবহার করা হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে খেজুর গাছের মতো এ গাছ কেটে রস নিয়ে তা দিয়ে অ্যালকোহল, চিনি ও ভিনেগার বা শিরকা বানানো হয়। গোলপাতার পাতা দিয়ে ঝুঁড়ি, ব্যাগ, টুপি, মাদুর ইত্যাদি বানানো যায়। গাছের মধ্যশিরা দিয়ে ঝাড়ুও বানানো হয়।

রোগবালাই ঃ গোলপাতার কোনো রোগবালাই হয় না বললেই চলে। প্রাকৃতিকভাবে জন্মে বলে এর রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা অত্যধিক।

সারমর্ম ঃ ছন ও গোলপাতা আমাদের অর্থকরী ফসল। এ দুটি উদ্ভিদ গামাঞ্চলে ঘরের ছাউনি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ছন পাহাড়ি এলাকায় এবং গোলপাতা লোনা পানির বনে, বিশেষ করে সুন্দরবনে পাওয়া যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। ছন কীভাবে বংশবিস্তার করে?
- ক) বীজ
- খ) মোথা
- গ) কাটিং
- ঘ) কলম

২। গোলপাতার পাতা দেখতে কেমন?
- ক) গোল
- খ) তালপাতার মতো
- গ) নারিকেলের পাতার মতো
- ঘ) কড়ই গাছের পাতার মতো

৩। ছন কোন্ ধরনের জমিতে হয়?
- ক) পাহাড়ি অঞ্চলে
- খ) নিচু এলাকায়
- গ) যেখানে বৃষ্টিপাত কম
- ঘ) লোনা পানি অঞ্চলে

৪। গোলপাতার বীজ দেখতে কেমন?
- ক) সুপারি মতো
- খ) মুরগির ডিমের মতো
- গ) অতি ক্ষুদ্র
- ঘ) তালের সমান

৫। গোলপাতার আদি নিবাস কোথায়
- ক) বাংলাদেশ ও ভারতসহ যেখানে প্রাকৃতিক লোনা পানির বন আছে সেসব দেশ
- খ) আফ্রিকা
- গ) নেপাল
- ঘ) ব্রাজিল

৬। কীভাবে গোলপাতার চাষ করা হয়?
- ক) বীজ দ্বারা প্রাকৃতিভাবে
- খ) বনায়নের মাধ্যমে
- গ) কপিসিংয়ের মাধ্যমে

ঘ) কলমের মাধ্যমে

চূড়ান্ত মূল্যায়ন – ইউনিট ৫

সংক্ষিপ্ত ও রচনামুলক প্রশ্ন

১। সেগুনের উদ্ভিদতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, বিস্তার, বংশবিস্তার পদ্ধতি এবং ব্যবহার সম্পর্কে লিখুন।
২। মেহগনি গাছের বংশবিস্তার পদ্ধতি এবং ব্যবহার সম্পর্কে লিখুন।
৩। শিশু গাছের বংশবিস্তার পদ্ধতি ও ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করুন।
৪। শাল গাছ কোথায় কোথায় পাওয়া যায়?
৫। শিলকড়ই গাছের বৈজ্ঞানিক নাম কী? শিলকড়ই কোথায় পাওয়া যায়?
৬। রেইনট্রি কোথায় পাওয়া যায়? এর ব্যবহার লিখুন।
৭। ইপিল-ইপিল কোথায় পাওয়া যায়? কীভাবে এর বংশবিস্তার হয়?
৮। ছনের বৈজ্ঞানিক নাম কী? ছন কোথায় জন্মে?
৯। গোলপাতার আকৃতির বর্ণনা দিন। গোলপাতা কোথায় জন্মে? গোলপাতার বংশবিস্তার কীভাবে হয়?
১০। বাংলাদেশের তিনটি কাঠ উৎপাদনকারী গাছের বৈজ্ঞানিক নাম, প্রাপ্তিস্থান, উদ্ভিদতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ও প্রজনন পদ্ধতির বর্ণনা দিন।

উত্তরমালা – ইউনিট ৫

পাঠ ৫.১

১। ঘ ২। গ ৩। ক ৪। খ ৫। গ ৬। ঘ ৭। ক

পাঠ ৫.২

১। ক ২। খ ৩। ঘ ৪। খ ৫। গ ৬। খ

পাঠ ৫.৩

১। ঘ ২। ক ৩। খ ৪। ক ৫। ক ৬। ক

পাঠ ৫.৪

১। গ ২। ক ৩। ক ৪। খ ৫। খ ৬। ক

পাঠ ৫.৫

১। খ ২। খ ৩। ক ৪। খ ৫। ক ৬। ক